বঙ্গবন্ধুর কৌশল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

শামস্ রহমান

ভারত ও চীন দুটি পাশাপাশি দেশ। আয়তন ও জনসংখ্যায় প্রায় কাছাকাছি। উপনিবেশিক শক্তি থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে উভয় দেশই এবং প্রায় একই সময়ে - ভারত ১৯৪৭ শে আর চীন ১৯৪৯ শে। তবে দু'দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাত্বিকভাবে দু'টি দু-মেরুতে অবস্থিত মতাদর্শনে। একটি অসহযোগ আন্দোলনে, অন্যটি সশস্ত্র সংগ্রামে। একটি অহিংসায় দেখে শক্তি ও মুক্তি, অন্যটি বন্দুকের নলে। একটি প্রবর্তিত হয় মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে, অন্যটি চেয়ারম্যান মাও'এর নেতৃত্বে।

পন্থা ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। গান্ধী, মাও উভয়েই চেয়েছেন উপনিবেশিক শক্তি থেকে মুক্তি, মানুষের কল্যাণ, সমাজের সমতা। উভয়েই ঘুরেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, সমাজকে চেনা, জানা আর বোঝার প্রয়াসে; সেই সাথে জনগণকে সংগবদ্ধ এবং উদবুদ্ধ করার জন্য। গান্ধীর 'সল্ট মার্চ' এবং মাও'এর 'লং মার্চ' – দু'দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মহাত্মা গান্ধী ধার্মিক ছিলেন এবং সে সময় ভারত যদিও জাতপাতে অনেক বিভাজন ছিল, তা সত্ত্বেও ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রেখেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অন্যদিকে চেয়ারম্যান মাও ছিলেন মার্ক্সীয় দর্শনে দিক্ষিত একজন কমিউনিষ্ট। তাই ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন ধর্ম-বর্ণের প্রভাব মুক্ত।

গান্ধীর মতাদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছে বহু জাতি এবং জন নেতা। এ পথে খুঁজেছে তারা তাদের নিজ নিজ জাতির মুক্তি। ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র একটি দীপ্তিমান দৃষ্টান্ত। ৫০-৬০'এর দশকে অসহযোগ ও অহিংসা আন্দোলনের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এফ্রো-আমেরিকানদের মৌলিক অধিকার। এ আন্দোলন জনগণকে সচেতন করেছে বটে, কিন্তু কতটুকু অধিকার আদায়ে সাফল্য এসেছে, তা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে। 'সিভিল রাইট মুভমেন্টের' প্রায় ষাট বছর পর সম্প্রতিকালের 'ব্লাক লাইফস্ ম্যাটার' আন্দোলন থেকেই তা পরষ্কার। নিকট অতীতের স্পেনের ক্যাটালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন আর একটি দৃষ্টান্ত। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগ্ণকে উদবুদ্ধ করে নির্বাচনে বিপুল জয়ের মাঝেও তারা ব্যর্থ হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনে।

মুক্তি আন্দোলনে চেয়ারম্যান মাও'এর আদর্শেও গ্রহণ করেছে এশিয়া, ইউরোপের বহু জাতি গোষ্ঠি। সশস্ত্র সংগ্রাম অবলম্বনে বছরের পর বছর যুদ্ধ করেও, লক্ষ ফোটা রক্ত ঝরিয়েও ব্যর্থ হয়েছে শ্রীলংকার তামিল, স্পেনের বাস্ক কান্ট্রি কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণ। ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নক্সালবাড়ী আন্দোলন, সেই সাথে পৃথিবীর বহু প্রান্তে বহু জাতির সশস্ত্র আন্দোলন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২০ বা ৪০ দশকে সংগঠিত না হয়ে যদি ৭০ দশকে হত, সে ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা অর্জনের পথে কতটুকু সফলতা বয়ে আনতো অসহযোগ ও অহিংসার পন্থা? কিংবা, মাও'এর সশস্ত্র সংগ্রামে তথা শুধু বন্দুকের নলে অর্জিত হত কি চীনের মুক্তি? এগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

বাংলাদেশ ভারত ও চীনের মাঝে অবস্থিত। আয়তন ও জনসংখ্যায় দুটি প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অনেক ছোট। ভারত ও চীনের স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় পচিশ বছর পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

গান্ধী ও মাও'এর মত বঙ্গবন্ধুও ছিলেন মানুষের মানুষ। তাইতো মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আনন্দ অনেক কাছে থেকে বোঝার প্রয়াসে বছরের পর বছর ঘুরেছেন পূর্ব বাংলার মাঠে ঘাটে। চেয়েছেন শোষকশ্রেণী থেকে মুক্তি, ন্যায্যতা আর মানুষে মানুষে সমতা। যার শক্তি ও দুর্বলতা, দু'ই ছিল মানুষকে ঘিরে। এক সাক্ষাৎকারে তার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং দুর্বলতা বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেনঃ "My greatest strength is the love of my people, and my

greatest weakness is that I love them too much"। সম্ভবত, রাজনীতির এ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বঙ্গবন্ধু পেরেছিলেন সমগ্র জাতিকে এক মঞ্চে এক মন্ত্রে দাঁড় করাতে এবং যার মাঝে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। গান্ধী ও মাওয়ের মতো বঙ্গবন্ধুও চেয়েছেন সকল প্রকার শোষণ ও অবিচার থেকে জনগণের মুক্তি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ, যার অগাধ বিশ্বাস ছিল জনগণের শক্তিতে, প্রত্যয় ছিল ন্যায্য অধিকার প্রদানে। যে অধিকার শুধুই ভোটের বাক্সে ভোট দেওয়ার অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যে অধিকার আরও বিস্তৃত, যা উৎপাদন ও বিতরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই সব উপাদানেই কি প্রকৃত গণতন্ত্র সঙ্গায়িত হওয়া অপরিহার্য, যা 'মানবিক গণতন্ত্র' নামে অভিহিত হতে পারে? আজকের বিশ্ব গনতন্ত্রের চিত্র কি বলে? সম্প্রতি ক্যাপিটল হিলে হামলা, ব্ল্যাক লাইফস্ ম্যাটার আন্দোলন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গত আড়াইশত বছরের গনতন্ত্র আর মানবাধিকার সম্পর্কে কি ধারণা দেয় বিশ্ববাসীকে? 'গ্লোবাল স্টেট অব ডেমোক্রেসি ২০২১' প্রতিবেদনই বা কি বার্তা দেয়? গণমুখী অর্থনৈতিক, সামাজিক সুব্যবস্থা ও ভারসাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির দাবীতে প্রচলিত ভোট-ভিত্তিক গণতন্ত্র কি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে? আর সেখানেই কি 'মানবিক গণতন্ত্রের' আবশ্যিকতা?

নিজ ধর্মে গভীর বিশ্বাস ও আস্থা নিয়েও, গান্ধী ও মাও'এর মত বঙ্গবন্ধুও আজীবন ধর্মকে রেখেছেন রাজনীতির বাইরে। মানুষের কল্লাণে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে ছিল তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল একটি রাজনৌতিক বিষয় নয়। এর একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চর্চায় সৃষ্ট বৈষম্য রাষ্ট্রিয় স্তরে অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং, বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণায় দুটি দিক লক্ষণীয় - এক, রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আচরণে 'কোন অসামঞ্জস্যতা' না থাকা, দুই, 'ধর্মের কোনো রাজনৈতিক ব্যবহার না হওয়া'।

নিঃসন্দেহে, বঙ্গবন্ধুর সময়কালে প্রাসঙ্গিক ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ। বর্তমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্ভবত এ আদর্শ আরও বেশী প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন যতার্থই বলেনঃ "A good understanding of secularism, as explained by Sheikh Mujib is particularly important right now in many countries. This applies not only in India, but also in other countries across the world"। আর তাই বঙ্গবন্ধুকে শুধু 'বাংলার মানুষের বন্ধু' না বলে 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে আক্ষায়িত করেন তিনি।

উল্লেখ্য যে ক্রমশ 'মানবিক গণতন্ত্র' ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কি ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশল?

বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালির স্বাধীনতার পথ খুজেঁছেন একাধিক কৌশলে। প্রসঙ্গটি বোঝার জন্য উন্নিশ ষাটের দশকের শুরুর দিগকার তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক) ষাটের দশকের শুরুতে বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ ও খোকা রায়ের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং বলেন, 'গণতন্ত্র-স্বায়ত্তশাসন এসব কিছুই পাঞ্জাবীরা দেবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাংলার মুক্তি নেই। স্বাধীনতাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য' (সাপ্তাহিক একতা, ১৯ আগস্ট ১৯৮৮)। তবে বলাই শেষ কথা ছিল না।

দুই) ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সনে আশারামবাড়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু আগরতলা যান, যা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অংশ। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গ্রন্থে উল্ল্যেখ করা হয় '... the Awami League supremo Sheikh Mujibur Rahman arrived in Agartala secretly to meet Sachindralal Singha, the chief minister of Tripura, to seek assistance for a possible independence campaign' (Bhaumik, The Agartala Doctrine, Oxford University press, p. 13, 2016)। পরবর্তি সময়ে এক সাক্ষাতকারে ত্রিপুরার চীফ মিনিস্টার বলেন 'This (Agartala

visit) was no surprise visit, we were expecting him'। সেই সাথে তিনি আরো যোগ করেন, 'Mujib made it clear that 'Bengalis could no longer live with honour and hope with Pakistan …' (Bhaumik, The Agartala Doctrine, Oxford University press, p. 14, 2016)।

বিষয়টি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে পৌঁছিলেও সেই সময় ভারত-চীন সীমান্তে বিরাজমান উত্তেজনার কারণে বেশী দূর এগুয়নি। তবে সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। পরবর্তিতে, প্রয়োজনে ভারতের সহযোগীতার আশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য ষাটের দশকের শেষ দিকে বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতা চিত্তরঞ্জন সূতারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারতের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার (Karim, Sheikh Mujib – Triumph and tragedy, p. 206, 2005)। এ প্রচেষ্টায় সম্ভবত শেষ যোগাযোগ ঘটে ১৯৭১'এর মার্চের শুরুতে যখন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের সাথে মিলিত হন। "৫ অথবা ৬ই মার্চে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন গোপনে সাক্ষাৎ করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে, সি, সেনগুপ্তের সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তান যদি সত্য সত্যই পূর্ব বাংলায় ধ্বংসতান্ডব শুরু করে, তবে সে অবস্থায় ভারত সরকার আক্রান্ত কর্মীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোন সাহায্য-সহযোগিতা করবে কিনা জানতে চাওয়া" (মঈদুল হাসান, মূলধারা'৭১, প. ১০, ১৯৮৬)।

ডেপুটি হাইকমিশনার সেনগুপ্ত সহযোগিতার আশ্বাসের খবর নিশ্চিত করেন ১৭ই মার্চ এই বলে যেঃ "… (পাকিস্তানি) 'আঘাত যদি নিতান্তই আসে', তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্য 'সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা' প্রদান করবে" (মঈদুল হাসান, মূলধারা'৭১, প. ১০, ১৯৮৬)।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে সহযোগিতার আশ্বাস নিশ্চিত করা বাংলদেশের স্বাধীনতার জনযুদ্ধে কতটুকু তাৎপর্য বহন করেছে তা ১৯৭১'এর পঁচিশে মার্চের মধ্য রাতে পাকিস্তানী বর্বরতাই প্রমান করে।

তিন) ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনে স্বাধীনতার উদ্দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে নিউক্লিয়াস বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি ও কামরুল আলম খান খসরু জড়িত ছিলেন। এই পরিষদ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' নামে পুনর্গ্ঠিত হয় (Rohena Alam Khan, Making the first flag of Bangladesh, Dhaka Tribune, 16 December 2021)। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে এই সংগঠন 'মুজিব বাহিনী' নামে আত্মপ্রকাশ করে যার নেতৃত্ব ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনই স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান পন্থা হলেও, পাশাপাশি শেষ সম্বল হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল বঙ্গবন্ধুর বিকল্প কৌশল। এ বিষয়টি উঠে আসে মঈদুল হাসানের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বতন্ত্র ধারার বর্ণ্নার মাঝে। তিনি বলেন "পাকিস্তানী শাসকবর্গ যদি কোন সময় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসী হয়, তবে সেই আপৎকালে আওয়ামী লীগপন্থী যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদানের জন্য শেখ মুজিব ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন" (মঈদুল হাসান, মূলধারা'৭১, প. ৭-৮, ১৯৮৬)।

তবে, বঙ্গবন্ধু এ যুদ্ধ দেখেছেন 'জনযুদ্ধ' রূপে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংযোজিত অংশ হিসেবে। কোন ক্রমেই শুধুই সামরিক যুদ্ধ হিসেবে নয়। তাইতো, ৭ মার্চের ভাষনে একদিকে অসহযোগের আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, অন্যদিকে, 'মহল্লায় মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে, 'যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত' থেকে 'শত্রুর মোকাবেলার' জন্য সশস্ত্র জনযুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর 'জনযুদ্ধের' প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উঠে আসে যখন আব্দুল গফফার চৌধুরী (সে সময়ে 'আওয়াজ' পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধুর একজন বন্ধুপ্রতিম সাংবাদিক) বঙ্গবন্ধুর কাছে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হুসেইনের (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন প্রধান আসামী) একটি প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ঘটানাটি ঘটে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর লাহোর গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার ঠিক আগে আগে। এই সাক্ষাতের শুরুতে গফফার চৌধুরী মোয়াজ্জম নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধু বলেনঃ "I know him (Muazzam). I also know all about his proposal. He has recently been hobnobbing with Manik Choudhury (a businessman from Chittagong). I have told Manik not to have anthing to do with this madness. I would also advise you not to get involved in it. Our struggle is for the extablishment of democracy and the realisation of autonomy for the people of Bangladesh. I have always fought against the Pakistani military junta. It is not the purpose of my movement to replace it with a Bengali military junta" (Karim, Sheikh Mujib – Triumph and tragedy, pp. 141-142, 2005)।

বঙ্গবন্ধুর কৌশল যদি শুধু চেয়ারম্যান মাও'এর সশস্ত্র সংগ্রাম ঘিরে হত, তবে কি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনে সফল হত? নাকি শুধুই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিগনিত হয়ে তামিল কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ড সহ বিশ্বের অন্যান্য সংগ্রামের মত অবস্থা হত? আর যদি শুধু মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আর অসহযোগের পন্থায় হত, তবে কি স্পেনের ক্যাটালোনিয়ানদের স্বাধীনতার ব্যর্থ আন্দোলন মত হত বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন? নাকি এফ্রো-আমেরিকানদের মৌলিক অধিকার আদায়ের মত আজও আমাদের 'ব্রাউন লাইফস্ ম্যাটার' আন্দোলন চালিয়ে যেতে হত?

উন্নিশ সত্তুর দশকের বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কৌশল হিসেবে বঙ্গবন্ধু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্র জনযুদ্ধের সমন্বয়ে নতুনভাবে প্রয়োগ করেছেন। সেখানেই বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব। পৃথিবীর খুব কম জাতিই আছে যারা গণতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলন আর সশস্ত্র জনযুদ্ধের সম্মন্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। এটা আমাদের বিশাল গর্বের জায়গা।

---

৬ ডিসেম্বর, ২০২১, মেলবর্ণ